**এক অ-ফ্যাসিবাদী জীবনের পথনির্দেশ**

প্রকাশিত হতে চলেছে। বাংলায় অনূদিত, 'অ্যান্টি ওয়েদিপাউস' গ্রন্থের মিশেল ফুকোর ভূমিকা এবং জিল দেলেউজের 'নিয়ন্ত্রিত সমাজের উপসংহারের পরের কথা'।

সম্ভাব্য মূল্য দশ টাকা।

মন্থন সাময়িকী পত্রিকার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।



# খবরের কাগজ সংবাদমন্থন

Vol 5 Issue 5 1 September 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

পঞ্চম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ রবিবার ২ টাকা



• ইটভাটা শ্রমিক পৃ ২ • চলতে চলতে পৃ ২ • পুকুর ভরাট পৃ ৩ • ঘরামি পিঁপড়ে পৃ ৩ • খাদ্য সুরক্ষা পৃ ৩ • ডুয়ার্স ভ্রমণ পৃ ৪ • ফুকুশিমা পৃ ৪ • যুদ্ধ পৃ ৪


## অতিবৃষ্টিতে হাইব্রিড স্বর্ণপঙ্কজ নষ্ট, দেশি সাদা ধান দিব্বি হয়েছে


১


২


৩


৪

**সঞ্জয় ঘোষ, জয়নগর, ২৪ আগস্ট •**

জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্তে মিত্রপাড়া বা রাধাবল্লভতলা দিয়ে আরো কিছুটা এগোলেই শুরু হল দুর্গাপুর পঞ্চায়েত অন্তর্ভুক্ত শসাপাড়া। এদিকে শসাপাড়া থেকে শুরু করে পরপর বেশ কয়েকটা গ্রামে রাজবংশী তীয়র সম্প্রদায়ের মানুষরা বাস করেন। এদিকটায় জয়নগর থেকে আদিগঙ্গার লুপ্ত হয়ে যাওয়া ধারার সঙ্গে যুক্ত খালের ঠিক পাশ ধরে ইটের পায়ে হাঁটা রাস্তা, যার দু-পাশে ধানক্ষেত সজিবাগান পুকুর গাছপালা — উন্মুক্ত প্রকৃতি।

শসাপাড়া গ্রামে ঢোকার কিছু পরেই দেখা হল চরণ কাঁজির(৩০) সাথে। অতিবৃষ্টির পরে চাষের অবস্থা কিরকম? জিজ্ঞাসা করতেই ও আমাকে যা যা বলল ও দেখাল, তা আমার ভাষায় নিচে উল্লেখ করছি। প্রথমে ও নিয়ে গেল মোবাইল টাওয়ারের পাশে একটা জমি দেখাতে। চরণের কথা অনুযায়ী এটা ওর মামা রাম ঘুগু(৪০-৪২)-র ১০ কাঠা জমি, যাতে গত পঞ্চায়েত থেকে বিনা পয়সায় গ্রামের কিছু লোককে দেওয়া হাইব্রিড স্বর্ণপঙ্কজ ধান রোয়া হয়েছিল। কিন্তু 'কেটে গেছে', মানে একদমই হয়নি (ছবি ১)। চরণ জানাল, বর্ষার আগে পঞ্চায়েত থেকে সে ১৫ কেজি স্বর্ণপঙ্কজ ধানের বীজ পেয়েছিল। চরণ এসইউসি দলের সমর্থক, এবং গত পঞ্চায়েত বোর্ড এসইউসি দলেরই ছিল। প্রধান আয়েন আলি ওকে বীজ দিয়েছিলেন। বিডিও থেকে লোক এসে গ্রামে সভা করে বলেছিল, তিন ফুট জলেও স্বর্ণপঙ্কজ ধান চাষ করে ভাল ফসল পাওয়া যাবে। কিন্তু চরণের কথা অনুযায়ী, আড়াই ফুট জলেই ওর নিজের জমিতে ওই স্বর্ণপঙ্কজ ধানের অবস্থা না হবারই মত (ছবি ২)। ও জানাল, ২ বিঘা জমিতে এই ধান লাগিয়েছে, তার থেকে ১৭ বস্তা (ওর মতে, এক বস্তা নাকি ৭৪ কেজি) ধান ও আশা করেছিল। এখন মালিকই ভরসা।

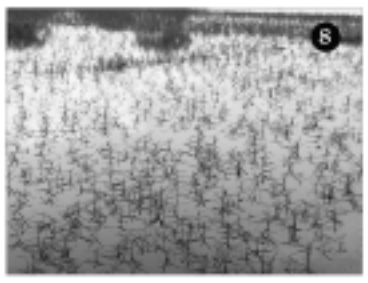

পাশ দিয়ে একজন মাঝবয়সী চাষি যাচ্ছিলেন। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, দাদা এই জমিতে কিরকম ধান হবে বলে মনে হচ্ছে? তিনি দেখে বললেন ১৪ বস্তা হত কিন্তু এখন যা অবস্থা পাঁচ কেজি থেকে বড়জোর ২০ কেজি হতে পারে, বীজধানটা হয়ে যাবে। কিন্তু ও দেখাল, ঠিক বাঁ পাশেই নূর আলি দেশি সাদা মোটা ধান লাগিয়েছিলেন। মাত্র ২০-২২ দিন আগে ওই ধান লাগানো হয়, কিন্তু ওর নিজের জমিতে আষাঢ় মাসের ২২-২৪ তারিখে মানে ৪৫-৫৭ দিন আগে লাগানো ধান গাছের চেয়ে লম্বা আর গোছও ভাল হয়েছে (ছবি ২ ও ৩)। আর এক জায়গায় ও দেখাল, দেশি সাদা মোটা ধান একইরকম ভাল হয়েছে। কিন্তু পাশেই পুরো আলের ওপর অনেক শসা গাছ এবং সেগুলোতে কিছুই হবেনা বলে জানাল। দেখলাম গাছের পাতাগুলো হলদেটে বা কালচে লাল হয়ে শুকিয়ে গেছে (ছবি ৩)।

আমরা এতক্ষণ জয়নগর থানা অঞ্চলের মধ্যে ছিলাম। এবার চরণ আরো পশ্চিমে যেখানে নিয়ে গেল, সেটা মগরাহাট থানার ঈশ্বরিপুর গ্রামের অঞ্চলের বলে জানা গেল। ও বলল, জায়গাটা হয়েছে মোটামুটি ওপরের হাই টেনশন ইলেকট্রিক লাইন বরাবর। তবে এখানে লোকালয় নেই, শুধুই ক্ষেত। আসল ঈশ্বরীপুর গ্রাম আরো দূরে, খালের ওপর পাকা ব্রিজ পেরিয়ে যেতে হয়। এইখানে চরণ শোলা চাষ করেছে প্রায় এক বিঘা জমিতে (ছবি ৪), জলের ওপর চার ছয় ইঞ্চি মাথা তুলেছে গাছ। এখানে ওর মতে, ফুট তিনেক জল। শোলা কিন্তু ৬-৭ ফুট জলেও ভাল হয়, তাই এদিকে বেশ কিছু জমিতে শোলা চাষ হয়েছে দেখলাম। চরণ জানাল, ওরা দুই ভাই বাবা মা দুই ভাই-বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে ১৭ জনের সংসার, মোট ৭ বিঘে জমি ওদের। সাড়ে তিন বিঘে নিচু জমিতে চাষ করতে পারেনি জল জমায়। কিছু জমিতে দুধেশ্বর (দেশি সুগন্ধী সরু ধান) লাগিয়েছে, সেটা নাকি হয়েছে। এটা ও বাজারে বিক্রি করবে বেশি দামের ধান বলে। কম দামের ধান ওরা নিজেদের সারা বছরের খাবার জন্য রাখে।

ফেরার পথে একটা পুকুরের পাশে বেশ কিছু হাঁস আর হাঁসা দেখিয়ে চরণ বলল, মনসা পুজোয় বিক্রি হবে ২৫০ টাকায় একটা হাঁসা। আমার মনে পড়ল, ভাদ্র সংক্রান্তির মনসা পুজোয় সারা সুন্দরবন অঞ্চলে মনসা দেবীর উদ্দেশে কিরকম হাঁসা বলি হয় সেই সব কথা। বলা দরকার, গ্রামে ঢোকা থেকে ফেরা পর্যন্ত রাস্তার পাশে খালের দুপাশে প্রচুর লোককে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে দেখেছি। এক মহিলাকেও দেখেছি, বাচ্চাদেরও হাতে ছিপ নিয়ে ঘুরতে দেখেছি। বৃদ্ধদেরও দেখেছি ঘুনি আতিল থেকে মাছ সংগ্রহ করার জন্য গলা জলে ডুব দিতে বা সাঁতার কাটতে। আসলে এখন জল জমায় ক্ষেতের কাজ নেই। তাই খাওয়ার জন্য সরকারি খাল থেকে মাছ সংগ্রহই একমাত্র কাজ।

## নিউ গড়িয়া থেকে বের করা জলে ডুবছে পূর্ব যাদবপুর

**অমলেন্দু সরকার, পঞ্চসায়র, পূর্ব যাদবপুর, ৩১ আগস্ট •**

আবারও ডুবল নবদিগন্ত, বুদেরহাট, শহীদস্মৃতি, মুকুন্দপুর, নয়াবাঁধ সহ পূর্ব যাদবপুরের বেশিরভাগ অংশ। কিছুদিন আগের ভারি বর্ষণে প্রায় সমস্ত এলাকাতেই হাঁটু সমান জল জমে যায়। মুকুন্দপুরের বর্ধিত এলাকা জেলেভেড়ি, খুদিরাবাদের বহু স্থানেই কোমর সমান জলে বাসিন্দারা অসহায় জীবনযাপন করতে থাকে। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের উদ্যোগে স্পিড বোট নামে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য। এছাড়া সরকারি উদ্যোগ তেমন চোখে পড়েনি। তবে শাসকদলের পক্ষ থেকে কিছু কিছু স্থানে চিঁড়ে গুড় দেওয়া হয়। বুদেরহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি লঙ্গরখানাও খোলা হয়। অনেক মানুষ সেখানে আশ্রয় নেয়।

কিন্তু আগের তুলনায় রাস্তাঘাট অনেকটা উঁচু হওয়া সত্ত্বেও কেন এত জল? এলাকার বাসিন্দারা মনে করে, বাইরের চাপান জলেই এই বিপদ। পার্শ্ববর্তী উচ্চবিত্তদের বাসস্থান নিউ গড়িয়া নিচু এলাকা হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেও জলমগ্ন হয়। মূলত সেখানকার জমা জল বের করার জন্য সরকারি উদ্যোগে একগুচ্ছই বুস্টার পাম্প বসানো হয়েছে। এই পাম্পের সাহায্যে নিউ গড়িয়া, ১বি বাসস্ট্যান্ড ও তৎসংলগ্ন এলাকার জল পার্শ্ববর্তী খালে পড়ে। কিন্তু খালটি সংস্কারের অভাবে এবং খালের বুদেরহাট সংলগ্ন অংশে কন্ট্রাক্টরের হাইড্র্যান্ট তৈরি করায় খালের জলধারণ ক্ষমতা অনেকটাই কমে গেছে। ফলে খাল-প্লাবিত জলে ডুবছে নবদিগন্ত, বুদেরহাট নতুনপল্লী, শহীদ স্মৃতির মতো গরীব এলাকার বাসিন্দারা।

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো, এই খালের জলে মিশছে সি-ফিস প্রসেসিং সেন্টারের (সামুদ্রিক মাছ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র) দশটি কোম্পানির নোংরা জল। তাতে বিপদ আরও বেড়েছে। অবস্থার এতটাই অবনতি হয় যে, পঞ্চসায়র বিদ্যানিকেতন সহ এলাকার অনেক বিদ্যালয়ে কয়েকদিনের জন্য ছুটি ঘোষণা করতে হয়।

**কর্পোরেটের বিরুদ্ধে**

'সাউথ সিটি'-র বিরুদ্ধে লড়াই-এর মুখ শম্ভুপ্রসাদ সিংকে নিয়ে তথ্যচিত্র — *কোয়ার্টার নাম্বার ৪/১১* (পরিচালক — রাণু ঘোষ)। ম্যাক্সমুলার ভবন। ১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যে ৬.৩০। আয়োজক — আলকামিয়া ও ম্যাক্সমুলার ভবন।

## বিজ্ঞানকর্মী নরেন্দ্র দাভোলকর আর আমাদের মধ্যে নেই

**তপন চন্দ, মাদারিহাট, জলপাইগুড়ি, ২৮ আগস্ট •**



কুসংস্কারের বশেই দরিদ্র ও রোগজীর্ণ মানুষ যুক্তিকে সরিয়ে রেখে রোগভোগ থেকে মুক্তি পেতে ছুটে যান বাবাজি, মাতাজি, পীর-ফকিরের থানে। ঢল নামে সব ধর্মবিশ্বাসী মানুষেরই। অন্যদিকে যুক্তিবাদও থেমে নেই। মহারাষ্ট্রের 'অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি'-র (এ এন এস) সদস্য-সমর্থক-কর্মীরা কুসংস্কার ও ব্ল্যাক ম্যাজিক বিরোধী আইন লাগু করার দাবিতে রক্ত দিয়ে চিঠি দিয়েছিল।

৩ মার্চ ২০০৯ তারিখে মহাত্মা ফুলেওয়াড়া থেকে শুরু হয়েছিল রক্ত দিয়ে পত্র লেখা ও গণস্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান। অভিযানের শেষ তারিখ ছিল ১৭ মার্চ ২০০৯। পত্রাবলী ও সংগৃহীত গণস্বাক্ষর পাঠানো হয়েছিল রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কর্তাব্যক্তিদের। এই 'অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি'-র শীর্ষ নেতা ছিলেন নরেন্দ্র দাভোলকর।

ম্যাজিসিয়ানরা যখন ম্যাজিক দেখান তখন তা শিল্পকলা হলেও, গুরুবাবা বা ধর্মীয় নেতা বা গুনিন-ওঝারা যখন রোগভোগ সারানো বা অন্য কোনও পার্থিব লাভের জন্য তা করেন তখন তা শিল্পকলা থাকে না। অর্থ দিন বা না দিন এটা প্রতারণা যা আইন করে বন্ধ করা উচিত। অর্থের লোভে কন্যা সন্তান বিসর্জন, পুত্রের লোভে শিশুবলি, মড়ক ঠেকাতে তথাকথিত ডাইনি নির্যাতন, ভূত ছাড়াতে কখনো মারধোর, কখনো বা জুতো মুখে দৌড় করানো বা ঝাঁটাপেটা, খরা কাটাতে বা রোগমুক্তির যজ্ঞানুষ্ঠান, অকাল মৃত্যু রোধে গাছ বা কুকুরের সাথে বিয়ে দেওয়া — এসব চট করে বন্ধ হবে কি না এসব নিয়েই ছিল আন্দোলন। কারণ জাদুবিশ্বাস তো আজকের নয়। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আদিতে ছিল এই জাদু। ঈশ্বরকে তুষ্ট করে রোগভোগ সারানো বা বৃষ্টি আনার মতো শুভ কাজ করা হল বলা হতো 'হোয়াইট ম্যাজিক' বা 'মিরাকল'। শয়তানের সঙ্গে যোগাযোগ, বাণ মেরে শত্রু বিনাশ বা ফসল ধ্বংস করার মতো ক্ষতিকর কাজকে বলা হত 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' বা 'অকাল্টিজম'। ভালো বা খারাপ দু'টিই দৈবঘটিত জাদুবিশ্বাস। এই জাদুবিশ্বাস কখন যে অলৌকিক ও ঐশ্বরিক ইমেজ নিয়ে ধর্মের মধ্যে সেঁধিয়েছে, কে তার খোঁজ রাখে! কোনটা ম্যাজিক আর কোনটা বুজরুকি বা প্রতারণা তা চিনতে চায়না ধর্মভীরু, দৈবরহস্যে উৎসুক সাধারণ মানুষ। কুসংস্কার বিরোধী আইন চালুর তোড়জোড় দেখে তাদের অনেকেই ভেবে নেয়, এটা তাদের ধর্মের ওপর আঘাত। ধর্মব্যবসায়ীরাও এই ভাবনাতে ধোঁয়া দেয়।

সম্ভবত ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ এর মধ্যে মহারাষ্ট্র বিধানসভায় কুসংস্কার বিরোধী বিলটি পেশ করেন পি জি দস্তুরকর। খসড়াটি পরিমার্জিতও হয়েছে, নানাস্তরের আপত্তিকে সম্মান জানিয়ে। কিন্তু বিলটি বিধানসভায় পাশ করানো যায়নি। সভায় অনেকেই আপত্তি তুলেছে — এই আইন চালু হলে দেশের, আদিবাসীদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিপন্ন হবে। যুক্তিবাদী আন্দোলনে তো হিংসার আশ্রয় নেওয়া যায় না, হয়ত তাই খানিকটা মরিয়া হয়েই রক্ত দিয়ে চিঠি লেখার কর্মসূচি।

*এরপর তিনের পাতায়*

## পঁয়ত্রিশ বছর কারাবাসের শাস্তি ঘোষণার পর ওবামাকে ব্র্যাডলি ম্যানিংয়ের চিঠি

**সূত্র http://www.bradleymanning.org, অনুবাদ শমীক সরকার, ২২ আগস্ট •**


ব্র্যাডলি ম্যানিং

প্রয়াত হাওয়ার্ড জিন একসময় বলেছিলেন, 'নিরীহ মানুষ খুনের লজ্জা ঢাকা দেওয়ার মতো বড়ো পতাকা হয় না।'

২০১০ সালে আমি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তার পেছনে ছিল আমার দেশ এবং যে পৃথিবীতে আমি বাস করি তার প্রতি আমার উদ্বেগ। ৯/১১-র দুঃখজনক ঘটনাবলীর পর আমাদের দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। আমরা এমন এক শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ লেগেছি যা চিরাচরিত কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতে চায় না। সেই জন্য আমাদের জীবনধারণের ওপর নেমে আসা ঝুঁকির মোকাবিলায় আমাদেরও যুদ্ধের কায়দা বদলাতে হয়েছে।

আমি প্রথমদিকে এই কায়দাগুলোর সঙ্গে একমত হয়েছিলাম এবং আমার দেশের সুরক্ষায় সাহায্য করতে স্বেচ্ছায় নেমেছিলাম। ইরাকে গিয়ে প্রতিদিনের গোপন মিলিটারি রিপোর্টগুলি পড়তে পড়তে, আমরা যে কাজ করছি তার নৈতিকতা নিয়ে আমার মনে প্রথম প্রশ্ন জাগতে শুরু করে। এই সময়েই আমি উপলব্ধি করি, আমাদের ওপর নেমে আসা ঝুঁকির মোকাবিলায় আমরা মানবিকতা ভুলেছি। আমরা ইরাক এবং আফগানিস্তানের মানুষের জীবনকে ধারাবাহিকভাবে মূল্যহীন করে তুলেছি। শত্রু বলে মনে করে মোকাবিলা করতে গিয়ে আমরা কখনও কখনও নিরীহ মানুষ মেরে ফেলেছি। যখনই আমরা নিরীহ মানুষ মেরেছি, তার দায়িত্ব নেওয়ার পরিবর্তে জাতীয় নিরাপত্তা এবং গোপনীয় তথ্যের ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছি, জবাব দেবার দায় এড়াতে।

শত্রু নিকেশ করার উল্লাসে আমরা নিজেদের মধ্যে অত্যাচারের সংজ্ঞা নিয়ে তর্ক করেছি। আমরা মানুষকে গুয়ান্তানামোতে রেখে দিয়েছি বছরের পর বছর, কোনও নিয়ম না মেনেই। আমরা ইরাকি সরকারের অত্যাচার এবং খতমগুলোর প্রতি দৃকপাত করিনি, এবং একাজের কোনও ব্যাখ্যা নেই। সন্ত্রাসের সঙ্গে যুদ্ধের নামে আমরা এরকম অগুনতি কাজ হজম করে ফেলেছি।

যারা ক্ষমতায় আছে, তারা যখন কোনও অনৈতিক কাজ করার পক্ষে সওয়াল করে, তখন দেশপ্রেমের ধুয়ো তুলে তা করা হয়। যখন এই দেশপ্রেমের ধুয়ো যুক্তিকে ছাপিয়ে যায়, তখন আমেরিকান সৈন্যকেই সাধারণত দেওয়া হয় কোনও খারাপ কাজের ভার।

গণতন্ত্রের গুণের জন্য এইধরনের খারাপ সময় আগেও এসেছে আমাদের দেশে — দি ট্রায়াল অব টিয়ার্স, দ্য ড্রেড স্কট ডিসিশন, ম্যাকার্থিজম, এবং জাপানিজ-আমেরিকান ইন্টারনমেন্ট ক্যাম্প তার কিছু উদাহরণ। আমি নিশ্চিত, ৯/১১-র পরের অনেক কাজকেই এই আলোকেই দেখবে ভবিষ্যত।

প্রয়াত হাওয়ার্ড জিন একসময় বলেছিলেন, 'নিরীহ মানুষ খুনের লজ্জা ঢাকা দেওয়ার মতো বড়ো পতাকা হয় না।'

আমি বুঝি, আমার কাজ আইন মানেনি। আমার কাজের জন্য যদি কেউ আহত হন, বা তা যদি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন করে থাকে তাহলে আমি দুঃখিত। আমি কাউকে আঘাত করার জন্য একাজ করিনি। আমি শুধু মানুষকে সাহায্য করতে চেয়েছি। আমি যখন গোপন নথি ফাঁস করার সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং অন্যদের প্রতি কর্তব্যবোধই আমার মধ্যে কাজ করেছে।

যদি আপনি আমার ক্ষমাপ্রার্থনা ফিরিয়ে দেন, তাহলে আমি শাস্তিভোগ করব, শুধু এটুকু জেনে যে একটি মুক্ত সমাজে বাস করার চড়া মাশুল দিতে হয় কখনও কখনও। আমি সেই মাশুল দিতে হাসিমুখে প্রস্তুত আছি, যদি তার মানে দাঁড়ায়, এর মাধ্যমেই আমরা পেতে পারি একটি দেশ যা সত্যিকারের স্বাধীনতার ধারনার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যেখানে সমস্ত মহিলা ও পুরুষ সমান হিসেবেই জন্মায়।

## সম্পাদকের কথা

# টাকার দামের লাগাম খোলার ইতিহাস

টাকার দাম দ্রুত পড়ে যাওয়ায় একটা হৈ চৈ শুরু হয়েছে। খুব স্বাভাবিক। তবু এই সময়ে একটু মনে করে নেওয়া দরকার টাকার দাম কবে বাঁধা ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বা আইএমএফ-এর মডেলে সমস্ত দেশের মুদ্রার দাম একটা নির্দিষ্ট মানের সোনার মূল্যে বাঁধা ছিল। সেই মূল্যের এক শতাংশ ওপরে বা নিচে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার দাম ওঠা পড়া করত। এটাকে অর্থনীতির ভাষায় 'সিক্সথ এক্সচেঞ্জ রেট রেজিম' বলা হত। তখন কোনো দেশের সরকারকে তার নিজস্ব মুদ্রার অবমূল্যায়ণ করতে হলে আইএমএফ-এর থেকে আগাম অনুমতি নিতে হত।

তারপর, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়া ইত্যাদি নানা ঘটনায় পৃথিবীর পটপরিবর্তন হল। এবং সত্তরের দশকের গোড়ায় এসে সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখল, ডলারেরও দাম পড়ে যেতে পারে। সেই হলো সূচনা। দুনিয়ার ফিনান্স ব্যবস্থা ভাঙতে থাকল। ধীরে ধীরে প্রধান প্রধান দেশগুলো তাদের নিজস্ব মুদ্রার মূল্যায়ন শুরু করল আইএমএফ-এর নিয়ম ভেঙে এবং আইএমএফ সেগুলোকেই বিধিবদ্ধ করতে থাকল। এখন যে মাছ-পটলের মতো বিদেশি মুদ্রা বিনিময়ের হার পাল্টাচ্ছে, তার শুরুয়াত হয়েছে তখন থেকে।

নব্বইয়ের দশকে গ্লোবালাইজেশনের পর থেকে শেয়ার ও অন্যান্য বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ উঠে গেল ও দেশগুলোর মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক এসে গেল। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের দেশেও সবরকম সরকারি নিয়ন্ত্রণ উঠে গেল।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি বা শেষ পর্যন্ত, আমাদের দেশের হাতে যে টাকা থাকত তা দিয়ে ইচ্ছে মতো ডলার কেনা যেত না। কিন্তু সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়ে এমন অবস্থা এল, যখন টাকা দিয়ে যত খুশি ডলার কেনা যায়। সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকায়, বিদেশ থেকে ডলার বেশি আসায় ডলারের দাম পড়েছে। এখন এদেশ থেকে ডলার বেশি সরে যাওয়ায় টাকার দাম পড়ছে। আমাদের দেশের তেল কোম্পানিগুলোকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেছে, বাজার থেকে ডলার কিনতে হবে না, আপাতত টাকার দাম পড়া ঠেকাতে কোম্পানিগুলোকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কই ডলার সরবরাহ করবে।

# শ্রমিকের চোখে ইটভাটা শিল্প

*সুকুমার হোড় রায়, কলকাতা, ৩ আগস্ট* •

— য়হা কৈ সড়ক নেহি হ্যায়, সির্ফ পাগদণ্ডি হ্যায়, রোজমরা জিন্দেগি কে লিয়ে আপনা সর-সামান, আনাজ, কাপড়া, লাত্তা যো ভি কুছ, কৈ চীজ কা জরুরত হোগা তো আপকো ইয়ে পাগদণ্ডিমে উতাও-চড়াও করকে বাজার যানা পড়েগা। বাজার নেহি হাট হ্যায়, যিসে মাণ্ডী কহা যায়ে। ও ভি পন্দ্রহা রোজ মে একবার, মাহিনামে দোবার।

এক নাগাড়ে কথাগুলি বলে সরজু প্রসাদ থামলো, আমার মুখের দিকে চোখ মেলে দিয়ে, অপলক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ দেখার পর কোনো প্রতিক্রিয়া জানতে না পেরে আবার সরজু প্রসাদ বলল, — ক্যায়া করু, গরিবি, লাচারি, মজবুরিমে পাপী পেট কে লিয়ে এহি কাম করনে পড়তা, বান্ধুয়া মজদুর গুলাম কি তরহা, একেলা নেহি হু না, বালবাচ্চা পরিবার হ্যায়। ইনসব কো পেট পালানা, খিলানা, পিলানা হ্যায় — বলে এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে শুরু করলো। সরজুর সাথে শিবলাল দু-হাতে থলে, মালপত্তর নিয়ে সরজুর কথা শেষ হতেই বলল, — বাজার বলিয়ে চাহে হাট বলিয়ে, কম দুর নেহি হ্যায়। তিন চার কিলোমিটার দুরীপে হ্যায়। ও ভি পয়দল চলকে যানা পড়তা, ফির ওয়াপস পয়দল হি আনা পড়তা। রোজানা নেহি, পন্দ্রহা দিনকে লিয়ে আপকো সবজি-মছলি, চাওল-আটা যো চীজ কা জরুরত হ্যায় আপকো মোলনা পড়েগা। পন্দ্রহা দিনমে ফুরসত মিলতে হ্যায়, হাটমে যাকর আনাজ-উনাজ সরসামান খরিদনেকা। রোজানা কমসে কম বারহ ঘন্টা সে ষোলা ঘন্টাতক কাজ করনে পড়তা হাম লোগোকো। আপনা পরিবার বালবাচ্চাকা আপনা গাও মে রহতে হ্যায় কেয়া। নেহি সবকো নেহি। হামলোগোন য্যাসা ভরাই আউর নিকাশি কা করণেবালা মজদুর কী পরিবার, আপনা মেহেরারু, বালবাচ্চা কে লেকর ইটভাট্টা মে কাম করতে হ্যায়। ক্যায়া করু হালত কি মজবুরি। বিবি, বালবাচ্চো কো ভি ইটভাট্টা মে মজদুরি করনে পড়তা।

আপনাদের বাচ্চাদের লেখা পড়া শেখাবেন না?

— বহুত উমীদ থি, লেকিন ক্যায়া করু। ফির ওহি বাত, হালত কি মজবুরি, — শিবলাল, সরজু একসাথে কথাগুলি উচ্চারণ করল। আবার সরজু বলতে শুরু করল, — দিনভর কাম করনে সে শ' রুপিয়া মজদুরি, ও ভি ছে মাহিনা কে লিয়ে। দিনমে বারাহ ষোলাহ ঘন্টা কাম, মেহনত করনে থক যাতে হু। রাত মে নিনদ্ মে আরাম করণে কা যো ফুরসত মিলতে হ্যায়, উতনি হি ব্যাস। সাল ভরকে লিয়ে দিনভর বারাহ ষোলাহ ঘন্টা কাম, ছে মাহিনা ইধার তো ছে মাহিনা দুসরা কাঁহী আউর মেহনত মজদুরি কা কাম মিলে তো রোটি রোজি, খানে পিনে কা গুজরা হোগা। নেহিতো আপন গাঁও ওয়াপস যা কর ঘর মে বৈঠা রহেনা পড়ে গা।

হতাশায় ভরা শিবলালের করুণ মুখ, অসহায় ভাব তার চোখে ফুটে উঠলো। দুঃখঝরা গলায় সে বলল,

— আপনা বাচ্চোকো যারা পড়ালিখা শিখা পাতা তো বাচ্চা সমঝদার হুঁশিয়ার বন যাতা থা। মগর কেয়া করু গরিবি অউর লাচারি চলতে কর নেহি পায়া। হাম লোগোকা ভাগ মে এহি লিখা হুয়া।

কথাগুলি থেমে থেমে বলেই চিন্তার মধ্যে ডুব দিল। আপন মনে কিছুক্ষণ চিন্তান্বিত হয়ে থাকার পর বললো, চলে, দের হো গ্যায়া। এরা উত্তরপ্রদেশের কাশিপুরের শ্রমিক।

আমাদের দেশের সরকারের শিল্প ও শ্রম দপ্তরের দৃষ্টিতে যে শিল্প, শিল্প হিসেবে গণ্য হয়না, তা হল ইটভাটা। এক একটি ইটভাটায় খুব কম করে দুশো থেকে আড়াইশো জন শ্রমিক কাজ করে। শোনা যায়, বছরে কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা করে এই শিল্পের মালিকরা। মালিকদের অ্যাসোসিয়েশন আছে, কিন্তু শ্রমিকদের ইউনিয়ন নেই। সরজু-শিবলালের সঙ্গে কথা বলে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমদিকের জেলাগুলির ইটভাটাগুলির সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানা গেল। কাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে ছয় প্রকার শ্রম বিভাজনে ইটভাটা শ্রমিকদের কাজ করতে হয় : ১) পথাই ২) ভরাই ৩) বেলদার ৪) নিকাশি ৫) জলাই ৬) রাবিশ।

কাজের ধরন ও শ্রম বিভাগ অনুসারে পৃথক পৃথক ভাবে গড়ে ওঠে, গড়ে তোলা হয় এদের বসতি। ছয় থেকে সাত ফুট উঁচু এ্যাসবেসটসের চাল দেওয়া ঘরে, ইটভাটার মজুররা একা বা তাদের পরিবার নিয়ে থাকেন। একই ইটভাটাতে কাজ করা সত্ত্বেও শ্রম বিভাগের দরুন, পরস্পরের সাথে বা এক বিভাগের শ্রমিকের সাথে অন্য বিভাগের শ্রমিকের কোনও সম্পর্ক থাকে না। রাখতে পারে না।

ইটকে আগুনে পুড়িয়ে পাকা করা হয়। ভাটিতে, আগুনে কাজ করে যারা, সেই শ্রমিকদের গ্রীষ্মকালে গরমে ভয়ংকর কষ্ট হয়। যারা এই কাজ করে, তা শুধু তারাই বোঝে। প্রতিদিন ৬ ঘন্টা করে দুটি শিফটে ১২ ঘন্টা কাজ করতে হয়।

ইটভাটাগুলির এক একটি বিভাগের শ্রমিকরা, এক একটি অঞ্চল বা 'জিলা'র মানুষ। সকলে একই অঞ্চল বা জেলার নয়। যারা আগুনে ইঁট পুড়িয়ে পাকা করে তারা উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড় জেলার সরোজের দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ। যারা রাবিশে কাজ করে, তারা উত্তর প্রদেশের ফতেহপুর জেলার প্রজাপতি জাতির মানুষ। পথাই (ইঁট তৈরি) কাজ যারা করেন, তাদের অধিকাংশই হল পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার, উত্তরপ্রদেশের মিরাট, বাগপত, শালমি জেলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ।

১০ থেকে ৭০ বছর বয়সের মানুষ এই ইটভাটাগুলিতে দৈনিক ১২ থেকে ১৬ ঘন্টা এক নাগাড়ে কাজ করার পর রাতে পাঁচ থেকে ছ-ঘন্টা শুয়ে ঘুমাবার জন্য বিশ্রাম পায়। নিকাশি ও ভরাইয়ের কাজ যারা করে, তারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ইটভাটাতে থাকেন শুধু। অন্যান্য বিভাগের শ্রমিকরা নন। নিকাশি ও ভরাই শ্রমিকদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা এই কাজে নিজেদের যুক্ত করে মজুর হিসেবে। দু-বেলা দু-মুঠো খেয়ে পরে বাঁচার তাগিদে। হাজার ইঁট মাথায় করে বয়ে এনে সাজাবার জন্য দৈনিক আশি থেকে একশ' টাকা মজুরি পায় এরা। নিকাশি শ্রমিকরা শুধু দৈহিক শ্রমই দেয় না, নিকাশি কাজের জন্য তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়। আশি হাজার থেকে এক লক্ষ টাকায় ঘোড়া কিনতে হয় তাদের নিকাশির কাজ করার জন্য। সারা ভারতে ছোটো বড়ো মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজারের মতো ইটভাটা আছে। চল্লিশ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ শ্রমিক এই ইটভাটাগুলিতে কাজ করে।

যেখানেই ইটভাটা গড়ে ওঠে, তার আশে পাশের জমি আর কৃষির উপযোগী থাকে না। ইটভাটার জন্য কৃষিজমি কৃষির অযোগ্য হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট আদেশ জারি করে, ইটভাটার জমির ভূ-স্তর পাঁচফুট পর্যন্ত কাটার জন্য রাজ্য সরকারকে পঞ্জীকরণের মাধ্যমে অনুমতি দিতে হবে। তবে বানানো যাবে ইটভাটা। পঞ্জীকরণের মাধ্যমে অনুমতি পাবার জন্য ইটভাটার মালিকদের অনেক চড়া দামে জমি কিনতে হবে, যা বর্তমান ইটভাটা মালিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের পুঁজির জোর অত বেশি নয়। ফলে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমের ইটভাটাগুলি বন্ধ হবার উপক্রম। শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে নির্মাণ শিল্প, বাড়ি-আবাসন নির্মাণের কাজে চলে আসছে। এর ফলে মালিক-ঠিকাদাররা লাভবান হচ্ছে। তারা শ্রমিকদের কম মজুরিতে তাদের শ্রম বেচতে বাধ্য করাচ্ছে। ইটের দামও বেড়েছে পাঁচ থেকে ছয়গুণ হারে।

সারা ভারতে ইঁট তৈরি শিল্পে বছরে চার হাজার কোটি টাকার মতো ব্যবসা হয়, সেই কারণে বড়ো পুঁজিরও এই শিল্পের দিকে নজর আছে। সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশে বিদেশি প্রযুক্তি নির্ভর, পুঁজি-নিবিড় ইটশিল্পের কারবারি বড়ো পুঁজির সুবিধা হওয়ার কথা।

## চলতে চলতে

# সহযাত্রী শ্রমিকরা

*অমিতাভ সেন, কলকাতা, ২২ আগস্ট* •

— এটা কি ওভারব্রীজ ? না; ওই তো ট্রেনের লাইন দেখছি, এই লাইনটা কোথায় গেছে?

আমার পেছনের সীটে বসা যাত্রীর প্রশ্ন শুনে বললাম, — এটা দক্ষিণের লাইন — সোনারপুর হয়ে ক্যানিং, ডায়মন্ডহারবার — ওইসবদিকে গেছে। এসডি ১৬ বাস তখন সুকান্ত সেতুতে উঠছে। আমার পাশের সিটের যাত্রী বললেন,

— আমরা এদিকে রাসবিহারীর মোড়ের বেশি আসিনি আগে।

— আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

— আমতলা, ডায়মন্ডহারবার লাইনে, ওদিকে বাস রাস্তা আছে। ট্রেনের লাইন আছে শুনেছি, দেখিনি। এটা কোন স্টেশন?

— যাদবপুর। এদিকে কোথায় এসছিলেন?

— হাসপাতালে। পিয়ারলেস হাসপাতাল।

— এতদূর আসতে হল?

— ইএসআই এখানে পাঠিয়েছে। ছেলের গলায় অপারেশন। দেড় বছরের ছেলে। তাকে খাবার খাওয়ালে নাক দিয়ে বেইরে যাচ্ছিল। জন্মের পর থেকেই ওরকম। ডাক্তার বলল, ছেলে বাবা-মা ডাকার আগেই আনলে ভালো; আবার বলল, দশ কিলো ওজন না হলে অপারেশন করা যাবে না। বোঝো কী করব? আজ অপারেশন হয়েছে। ছেলের মা রয়েছে ছেলের সাথে। ডাক্তার বলল, ভালোই আছে। অক্সিজেন দেওয়া আছে।

আমার আর পাশের যাত্রীর কথাবার্তার মধ্যেই পেছনের যাত্রীর গলা, ওই দ্যাখ ওটা কোনও পার্ক মনে হয়। পেছনের যাত্রীর হাতের আঙুল জানলার বাইরে। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্যে বাড়ানো। আমি বললাম, না ওটা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। পেছনের যাত্রী একটু বেশি সরল। অনেক কথা বলেন,

— জানো, আমরা একটা বিশ্ববিদ্যালয় দেখেছিলাম। বেড়াতে গেছলাম। নালন্দা না কী নাম বলল। একেবারে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখেছে। কোনও উন্নয়ন নেই। — বললাম,

— ওটা অনেক পুরোনো সময়ে ছিল। তা হবে। খালি পাথর। সে যে কী বড়ো বড়ো। এখন খালি জঙ্গল। তাই দেখতেই পাঁচটাকা করে টিকিট নিয়ে নিল।

পাশের যাত্রীর সঙ্গে গল্প করে জানলাম, ওরা থাকে আমতলা থেকে একটু ভেতরে। কাজ করে সেখ্যুরি প্লাইউড কারখানায়। কারখানা ঠাকুরপুকুর থেকে একটু দূরে। ওরা সাইকেল চালিয়ে আসে বাড়ি থেকে। দু-শিফটে কাজ হয়। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা। আবার সন্ধ্যে ৬টা থেকে সকাল ৬টা। ছ-হাজার লোক কাজ করে। ওদের মজুরি ৩৫০ টাকা রোজ। সপ্তাহে একদিন ছুটি, রবিবারে। তা বাদে বছরে ১৪ দিন ছুটি। আর অসুখ করলে ডাক্তারকে লিখিয়ে ছুটি পাওয়া যায়। পাশের সহযাত্রীর ভাষায়,

— শরীর খারাপ থাকলে ছুটি তো দিতেই হবে? কাজ করব কী করে অসুখ নিয়ে। খাটনি আছে না?

— হ্যাঁ, ১২ ঘন্টা করে কাজ তো, বলে আমি সায় দিই। শ্রমিকটি হাসেন,

— ১২ ঘন্টা কিন্তু খাতায় কলমে ৮ ঘন্টা। অনেক দু-নম্বরি ধান্দা আছে কারবারে।

— মালিক কি বাঙালি?

— নাঃ, কী জানি না। তবে অবাঙালি।

— ইউনিয়ন আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সব পার্টির ইউনিয়ন আছে। অত লোক কাজ করে, কেউ ছাড়ে! ওই পার্টির লোকগুলোই বেশি খচ্চর। বরং মালিক ভালো। ম্যানেজারও ভালো।

আমি অবাক হয়ে শুনি। একটু আগে মালিকের দু-নম্বরি ধান্দার কথা বলল। তারপর ভাবি, পার্টির ইউনিয়নগুলো বোধহয় আরো বেশি, তিন নম্বরি ধান্দা কিছু করে ওখানে। পেছনের সহযাত্রীর গলা শুনতে পাই, দোকান জামাকাপড়ের — মেলাই — সেই তখন থেকেই চলছে।

বাসটা গড়িয়াহাট পেরিয়ে লেকমার্কেটের কাছে চলে এসেছে, সেখানে আমায় নামতে হবে। আমায় উঠতে দেখে সহযাত্রী শ্রমিকরা বলে, আপনি এখানে থাকেন? — নাঃ আরেকটু এগিয়ে, বলে আমি বাসের দরজার দিকে এগোই। পেছনে তাকিয়ে দেখি ওরা নিবিষ্ট মনে ঝলমলে আলো লাগানো দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

# সংবাদমন্থনের ষান্মাসিক পর্যালোচনা সভার রিপোর্ট

*তমাল ভৌমিক, ২৫ আগস্ট* •

সংবাদমন্থনের ষান্মাসিক পর্যালোচনা সভা হ'ল ১৮ আগস্ট ২০১৩, কলেজ স্ট্রীটের ঘোষকেবিনের দোতলার ঘরে। দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই সভায় ২৫ জন উপস্থিত ছিল। সভায় প্রধান প্রধান যে কথাগুলো উঠে আসে, সেগুলো নিচে দেওয়া হল।

যে খবরগুলো পাঠকদের ভালো লেগেছে, তার মধ্যে আছে, আফ্রিকার উপজাতিদের বিচার ব্যবস্থা, কোচবিহার থেকে দক্ষিণ ভারতে শ্রমিকদের যাত্রা, সেবির কালো তালিকাভুক্ত কোম্পানির তালিকা, পজিটিভ খবর -- যেমন, বসুন্ধরা পরিবার নামক চিটফান্ডের খবর, কুডানকুলাম নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের তোতাকাহিনী, নুপুর ও পলাশের মৃত্যু, রেশন ব্যবস্থা নিয়ে খবর, চলতে চলতে ...।

পছন্দ না হওয়া খবরগুলোর মধ্যে আছে, গ্রামের সাংস্কৃতিক উৎসব নিয়ে রিপোর্ট, যার মধ্যে কুসংস্কারের কথা আছে। এই প্রসঙ্গে একটি মত ছিল, ওইসব খবরের সঙ্গে সম্পাদকীয় টীকা দেওয়া যেতে পারে। অন্য একটি মত ছিল, সম্পাদকীয় টীকা দিতে গেলে প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলে দেওয়া দরকার, কারণ প্রতিবেদক সবচেয়ে ভালো জানেন বাস্তবটা, যা সম্পাদকীয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সম্পাদকীয় টীকা দিতে গেলে সংবাদের জায়গা কি কম হয়ে যাবে না? শেষে ঠিক হয়, সম্পাদকীয় টীকার বদলে বিভিন্ন পাঠকের মতামত প্রকাশ করা হবে। এই ব্যাপারে একটি নিয়মিত কলাম হবে। এটির দায়িত্ব নেন বঙ্কিম।

অপছন্দের তালিকায় থাকা খবরের মধ্যে রয়েছে মার্কিন নজরদারির খবর, কিছু ভ্রমণকাহিনী, মিশর নিয়ে খবর। মিশরের খবর বিষয়ে সম্পাদক জানান, 'আরব বসন্ত'-এর অন্যতম দেশ মিশরের খবর ফলো করার কারণ রাজনৈতিক। ব্রাদারহুড সমর্থকদের ওপর মিলিটারির ভয়াবহ গণহত্যার আগে মিলিটারি প্রধানের ডাকে সাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায় নেমেছিল ব্রাদারহুড নিধনে সম্মতি জানাতে। এ এক ক্লাসিকাল ফ্যাসিবাদ। সম্পাদক আরও জানান, দেশের ক্ষেত্রেও এমন হয়। যেমন গোর্খাল্যান্ড নিয়ে খবর। আজ এই আন্দোলন নিয়ে কোনও খবর না ছাপানোটা পত্রিকার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। অথচ, গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন একটি রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, প্রান্তিক মানুষের খবর নয়। রাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর এবং প্রান্তিক মানুষের খবর-এর মধ্যে জায়গা ভাগাভাগির ক্ষেত্রে সম্পাদকের মধ্যে দ্বন্দ্ব কাজ করে। এই ব্যাপারে পাঠকরা ভাবতে সাহায্য করলে ভালো হয়।

পত্রিকার ভাষা ও বানান নিয়েও বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। শেষ তিনটে সংখ্যায় ভুলের পরিমাণ বেশি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাক্য গঠনেও ভুল থেকে গেছে। এর জন্য সাময়িক সাংগঠনিক সমস্যা কিছুটা দায়ী। এই বিষয়ে জিতেন নন্দী বিস্তারিতভাবে জানান, কী পদ্ধতিতে পত্রিকা কম্পোজ, প্রুফ দেখা ও ছাপানো হয়। তিনি একটাই বানান বিধি সকল কম্পোজারকে অনুসরণ করতে বলেন। কিছু উদাহরণও দেন। তাছাড়া একই লেখায় একই শব্দের দু-রকম বানান — এই ধরনের নানারকম ভুলেরও উল্লেখ করেন।

পত্রিকায় কী ধরনের খবর থাকা উচিত তা নিয়ে নানা মতামত উঠে আসে। যেমন, গ্রামীন অর্থনীতির খারাপ অবস্থার খবর, স্ব-স্বাস্থ্য, বিকল্প চিকিৎসা, ওষুধের ন্যায্য মূল্যের দোকান, জেনেরিক ওষুধ, জেলার হাসপাতালের অব্যবস্থা, সুন্দরবনের পরিবেশে ক্রাশার, পরিবেশ ধ্বংস করার বিরুদ্ধে লোকায়ত স্তরে বহুদিন ধরে চলে আসা বিধিনিষেধের খবর, শিক্ষিত বেকারদের কেরিয়ার চিন্তা ও তাদের জন্য পাতা ফাঁদ, ফুটপাথবাসীদের অবস্থা (আমাদের ঘরের বাইরে যে শিশু ক্ষুধা মেটাচ্ছে নেশা করে, তার খবর উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয়ের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় — একজনের মত) — এসব নিয়ে খবর প্রকাশ করা দরকার। পত্রিকায় প্রান্তিক মানুষদের খবর কম আসার বা তাদের ভাষায় খবর কম আসার একটা সমালোচনা আসে।

স্থানীয় খবর হিসেবে মেটিয়াবুরুজের খবর বেশি আসার পক্ষে ও বিপক্ষে কথা হয়। যেখানকার খবর, সেখানে ছাপানো কাগজটা পৌঁছনোর গুরুত্বের কথা উঠে আসে। এভাবেই মেটিয়াবুরুজের খবর বেড়েছে।

বিভিন্ন জায়গা থেকে স্থানীয় কাগজ এসে জড়ো হয় জিতেন নন্দীর ঠিকানায়। পাঁচটা ছোটো কাগজ নিয়েও একটা সংসার হতে পারে। ওই কাগজগুলো থেকে ধারাবাহিক একটি কলম থাকা দরকার। দায়িত্ব নেন গৌতম গাঙ্গুলী।

পাঠক সভা বা পর্যালোচনা সভা ঘুরে ঘুরে হওয়ার ব্যাপারে একমত হন সবাই। সংবাদমন্থন ওয়েবসাইটে নিয়মিত (প্রতিদিন) খবর পোস্ট করা হয়। এই নিবিড় কাজটি পাঁচ হাতে করলে ভালো হয়, তাই সংবাদমন্থনের নিয়মিত পাঠক ও সংবাদ প্রেরকদের মধ্যে থেকে ওয়েবসাইটের জন্য একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করার প্রস্তাব দেওয়া হয় সম্পাদকের তরফে। ওই সম্পাদকরা স্বাধীনভাবে নিয়মিত ওয়েবসাইটে খবর পোস্ট করবেন। জিতেন নন্দী জানান, প্রথম থেকেই কাগজের বাস্তব সম্পাদনার কাজটি করছে শমীক সরকার। সম্পাদকীয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখার পথটি খোলাই রয়েছে। জিতেন বা শমীক বেশিরভাগ সম্পাদকীয় লিখলেও হেলালউদ্দীন এবং বঙ্কিম ও তমাল একটি করে সম্পাদকীয় লিখেছেন। তবে কাগজ বা ওয়েবসাইটের সামগ্রিক সম্পাদনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা কলেজ স্ট্রীটের সাপ্তাহিক বৈঠক। প্রতি মঙ্গলবার বেলা ২-৬টা কলেজ স্ট্রীটে বাকচর্চার ঘরে বসে সমস্ত খবরাখবর বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ, মতামত, ভুল-ঠিকের আলোচনা হবে।

সভায় সম্পাদক ২০১২ সালের হিসেব দেন : জমা ১৮৪১৮ টাকা (পোস্টাল গ্রাহক — ৬১৪৪ টাকা, ডিস্ট্রিবিউটর — ১১১৯৪ টাকা, বকেয়া — ১০৮০ টাকা)। খরচ ২০১৯৫ টাকা (কাগজ - ৯১২৫ টাকা, প্রিন্ট — ৬৭২০ টাকা, ট্রেসিং পেপার — ৫৪০ টাকা, স্ট্যাম্প — ১৬৫০ টাকা, কুরিয়ার — ২৮৮০ টাকা)। গত বছরে কাগজের গড় বিক্রি ৬৫০।

# 'মাইকের সামনে ভরাটের বিরুদ্ধে, পরক্ষণেই ঝিল বোজাতে প্রোমোটারদের মদত পৌরপিতার'

সংস্কার না হওয়া ব্যাঙ্কপ্লট ঝিলের ছবি প্রতিবেদকের তোলা

**শ্রীমান চক্রবর্তী, ব্যাঙ্কপ্লট, ১৫ আগস্ট •**
কোলকাতা পুরসভার যাদবপুর সংলগ্ন ৯২ নং ও ১০৪ নং ওয়ার্ডের সংযোগস্থলে অবস্থিত একটি জলাশয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন এলাকার কিছু প্রবীণ নাগরিক। স্থানীয়ভাবে অঞ্জনসরণীর এই জলাশয় বাঁচানোর কোন তাগিদ চোখে পড়েনি। উপরন্তু জলাশয়ের মধ্যে এলাকার বসবাসকারী বেশ কিছু মানুষের আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের জমি রয়েছে। বছর খানেক আগে থেকে হঠাৎ জলাশয়টির প্রায় মাঝ বরাবর পশ্চিমদিক থেকে একটি রাস্তা তৈরির জন্য জলাশয় ভরাট শুরু করা হয়। পরে নাগরিকদের প্রতিবাদে তা বন্ধও হয়। কিন্তু মাঝে মধ্যেই রাতের অন্ধকারে লরি করে মাটি এনে সেখানে বোজানো হতে থাকে। পরে এলাকাবাসীর একাংশের চাপে প্রোমোটার-দালালরা তা বন্ধ করলেও, নানা হুমকি শাসানি চলতে থাকে।

দীর্ঘদিন এই অঞ্চলের জলাশয়গুলির অংশ বিশেষে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকায় সেগুলির কোনো সংস্কারও হয়নি। 'দক্ষিণ পূর্ব কলকাতা জনস্বার্থ মঞ্চ'-র তরফে বছর তিনেক আগেও এই অঞ্চলের জলাশয়গুলির সংস্কারের আবেদন জানিয়ে পুরসভার কাছে একটা গণ-স্বাক্ষর সহ আবেদন জমা দেওয়া হয়। যদিও তাতে কোনো সুরাহা হয়নি। এ বছরের শুরুতে ব্যাঙ্কপ্লট-এর এই উল্লিখিত জলাশয়টি পুরসভার অনুমতিক্রমে একটি বেসরকারী সংস্থা ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু তা পর্যাপ্ত ছিল না। ইতিমধ্যে পুরসভার তরফে জলাশয় সম্পর্কে একটি নোটিশ জারি হলে তাতে কিছু ভুল ধরা পড়ে। এই সুযোগে এলাকার কিছু অসাধু প্রোমোটার ও দালাল চক্র স্থানীয় কাউন্সিলারের মদতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রোমোটারদের একটি গোষ্ঠী স্থানীয় কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের সই নিয়ে পৌরপিতাকে জমাও দেয়। পরে আবার পুরসভার তরফে সংশোধনী নোটিশ জারি করা হয়। ৯২ নং কাউন্সিলারের চেষ্টায় জলাশয়টির কিছু অংশ পরিষ্কার করা সম্ভব হলেও সবটা করা সম্ভব হয়না ১০৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের অসহযোগিতার কারণে। ইতি মধ্যে জলাশয়টিতে আবর্জনা ফেলে ময়লা করার কাজও সমানভাবে চলতে থাকে স্থানীয় একদল কুচক্রীর মদতে।

এই অবস্থায় স্থানীয় 'জলাশয় বাঁচাও কমিটি'র তরফে নিজস্ব উদ্যোগে গত ১৪ জুলাই পরিষ্কার করানোর কাজ শুরু হলে প্রোমোটারদের একাংশের মদতে পুলিশ এসে কাজের তদারকি করতে থাকা ৭৩ বছর বয়স্ক নির্মল চৌধুরী, বাবলু মুখুটি সহ কর্মরত ব্যক্তিদের থানায় নিয়ে যায় অন্যের জমিতে মাটি কাটার অভিযোগে। পুলিশ স্থানীয় প্রোমোটার ও দালালদের কাছ থেকে শুনে কোনোরকম খোঁজ খবর না নিয়েই এভাবে পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীদের হেনস্থা করায় এলাকার সকল সমাজ সচেতন মানুষই একটু অবাক। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এলাকাবাসীর তরফে একটা গণ-ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাতে পুলিশের এই বেআইনি কার্যকলাপের নিন্দা করা হয়। এবং এই এলাকাতেই ত্রিকোণ পার্কে আরেকটি জলাশয় বোজানোর অভিযোগ জানানো হয়।

ব্যাঙ্কপ্লটের বাসিন্দা, ১০৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতার 'কাছের মানুষ' বলে এলাকায় পরিচিত রাজা নামে এক প্রোমোটার-সাপ্লায়ারের মদতে পরিবেশ আন্দোলনের সাথে যুক্ত প্রবীণ মানুষদের নানান হুমকি, শাসানো ও কটূক্তিও চলছে। ডেপুটেশনের দিন, এমনকি এর আগে পরিবেশ কর্মীরা যখন পুলিশি হেনস্থার পর নিজেদের মধ্যে কথা বলার জন্য জলাশয়টির সামনে সমবেত হয়েছিল, সেদিন পুলিশ এবং ৯২নং ওয়ার্ডের পৌরমাতার সামনেই রাজা নামে প্রোমোটার-সাপ্লায়ার এসে পরিবেশ কর্মীদের শাসাতে থাকে। তার অভিযোগ, আমরা এলাকায় গণ্ডগোল করছি। পুলিশের সামনেই কয়েকজন কর্মীর সাথে তার বচসাও হয়। পরিবেশকর্মীদের প্রশ্ন, ওই জলাশয়টির মধ্যে দিয়ে রাস্তা বানানোর জন্য তার এত তৎপরতা কেন? ১০৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতাও এতটা নিষ্ক্রিয় কেন? তিনি মাইকের সামনে এসে ভরাটের বিরুদ্ধে বললেও, পরক্ষণেই জলাশয় বোজানোর পক্ষে প্রোমোটারদের মদত দিচ্ছেন? ত্রিকোণ পার্কের কাছের জলাশয়টি আবার রাতের অন্ধকারে বোজানো হচ্ছে কেন? এই নানান প্রশ্ন এলাকার মানুষের মনেও উঁকি দিচ্ছে।

# ঘরামি পিঁপড়ের বাসা

***জিতেন নন্দী, রবীন্দ্রনগর, সন্তোষপুর, ১৩ আগস্ট •***
আষাঢ় মাসের গোড়ার দিকের বৃষ্টিতে যখন আমাদের করবী গাছটা বেশ ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে, একদিন লক্ষ করলাম তার ভিতরে কতকগুলো পিঁপড়ের বাসা। করবী নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে একটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বাসাগুলো ভেঙে দিতেই পিলপিল করে বেরিয়ে এল শত শত পিঁপড়ে। আমি সাবধানে সরে এলাম। এরপর দেখলাম, আমাদের বারান্দার এক কোণে বেলফুল গাছের ডাল ঘেঁষে আর একটা ওরকম বাসা। যদি পিঁপড়েরা ঘরে ঢুকে পড়ে সর্বনাশ! তখন ওদের ডেঁয়ো পিঁপড়েই মনে হয়েছিল, কামড় খেয়েছি বেশ কয়েকবার। তাই আবার ভেঙে দিলাম ওদের বাসা।

এরপর মাসখানেক আগে একটা পাতিলেবু গাছের ডালের মাঝামাঝি জায়গায় দেখলাম ওই পিঁপড়ের বাসা। তখন বর্ষা এসে গেছে। শুকনো পাতার আঁশ দিয়ে বানানো, তবে কেমন একটা ছাড়া ছাড়া।

আজ বিকেলে সেই বাসাটা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। একদম নিটোল বুনট, যেন পাখির বাসার মতোই দেখতে। এই শ্রাবণের শেষের ভরা বর্ষার দাপটেও কিন্তু বাসাটা নষ্ট হয়ে যায়নি। চোখটা কাছে নিয়ে গিয়ে দেখি, ওপরের দিকে একটা ফুটো দরজার মতো, সেখান দিয়ে পিঁপড়েরা দিব্যি যাতায়াত করছে। লেবু গাছটার ওপরের ডগায় কচি পাতায় দেখলাম আর একদল পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ধীর গতিতে। কিছুক্ষণ দেখে বুঝলাম, ওই পাতাগুলো ওরা মুখ দিয়ে কাটছে, সম্ভবত খাচ্ছেও। আরও কাছে গিয়ে দেখলাম, অনেকটা কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ের মতো দেখতে হলেও আকৃতিতে একটু লম্বাটে রোগা আর ওদের পিছনের ডিম্বাকৃতি কালো অংশটার গায়ে সাদা একটা ডোরা।

এর আগে আমি ভাবতাম পিঁপড়েরা থাকে ঘরের মেঝে বা দেওয়ালের ফাটলে কিংবা গাছের কোটরে। গাছে বা দেওয়ালে যে তারা এত সুন্দর বাসা বাঁধতে পারে আমার জানা ছিল না। পিঁপড়েদের শ্রমিক, যোদ্ধা ইত্যাদি আখ্যা দিতে শুনেছি, কিন্তু তারা যে পাকা ঘরামি আজ জানলাম।

## মেগাসিটি মেগাজল

**সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ২৯ আগস্ট •**
২৮ আগস্ট শান্তিপুর ওরিয়েন্টাল স্কুলে রায় কোচিং সেন্টারের আয়োজনে 'মেগাসিটি মেগাজল' নামে এক মনোজ্ঞ জল বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো। প্রায় শ-দুয়েক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে জল যে কী করে পণ্যে পরিণত হচ্ছে, তা অত্যন্ত সহজ ভাষায় বোঝান বিশেষজ্ঞ দেবাশিস সেনগুপ্ত ও পরমেশ গোস্বামী। ছাত্রছাত্রীরাও তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থিত বক্তাদের কাছ থেকে জেনে নেন।

**বেশ কয়েক বছর ধরেই শান্তিপুরে রায় কোচিং সেন্টার বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ বিষয়ক কাজ করে থাকে। গত পাঁচই জুন পরিবেশ দিবস থেকে টানা তিনমাস ধরে বিভিন্ন পরিবেশ বিষয়ক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে তাদের এই কর্মসূচী ২৮ আগস্ট শেষ হলো। রায় কোচিং সেন্টারের প্রধান কাশীনাথ রায় জানালেন, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতার লক্ষ্যেই তারা প্রতিবছর এই উদ্যোগ নিয়ে থাকেন।**

## গঙ্গারামপুরে দাভোলকর হত্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

***মলয় মণ্ডল, সম্পাদক, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, গঙ্গারামপুর শাখা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৫ আগস্ট •***
**মহারাষ্ট্রের বিজ্ঞানকর্মী নরেন্দ্র দাভোলকরের নৃশংস খুনের প্রতিবাদে ২২ আগস্ট দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে বিকেল পাঁচটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত একটি প্রতিবাদী পথ পরিক্রমা হয়। ভ্যানে করে ব্যাটারি চালিত মাইকে এই হত্যার তীব্র নিন্দা করে যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা। প্রায় ২০০টি পোস্টারের সাহায্যে এই বিক্ষোভ সংগঠিত হয় মিতা সিনেমা হল, নিউ মার্কেট মোড়, হাই রোড মোড়, থানা মোড় এবং বাস স্ট্যান্ড মোড়ে। একেকটা জায়গায় ২০–২৫ মিনিট করে বিক্ষোভ চলে।**

**প্রথম পাতার পর**

## নরেন্দ্র দাভোলকর

এই বিলের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিল শিবসেনা এবং তাদের সাংস্কৃতিক সংগঠন 'হিন্দু জনজাগৃতি সমিতি'। তারা বলেছিল, কুসংস্কার বিরোধী বিল হিন্দু বিরোধী। এই বিলে মুসলিম বা অন্য কোনও ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে একটি কথা না বলা হলেও আঘাত করা হচ্ছে হিন্দুদের ঐতিহ্য, বিশ্বাস, লোকাচার ও সংস্কারকে। তাদের পত্রিকা 'দৈনিক সনাতন প্রভাত'-এ লেখা হয়েছিল, কুসংস্কার বিরোধী বিল বলবৎ করতে নানা সস্তা চমকের আশ্রয় নিয়েছে রাজ্যের বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মী ও যুক্তিবাদীরা। কখনও প্রকাশ্যে 'নিজের গালে গণ-চপেটাঘাত' করে, কখনও বা 'রক্ত দিয়ে চিঠি লিখে' বিলের সমর্থনে জনমত তৈরি করতে চাইছে — এসব হাস্যকর ও বিপজ্জনক। এ এন এস-এর ব্যানার ও পোস্টার লক্ষ্য করে শিবসৈনিকরা রাজ্যব্যাপী 'জুতো ছোঁড়া'র কর্মসূচী নেয়। রক্তে কলম ডুবিয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লেখার কর্মসূচীকে তুলোধোনা করে তারা বলেছিল, বিজ্ঞানকর্মীদের এ কেমন অবৈজ্ঞানিক কাজ! পেশায় চিকিৎসক দাভোলকর জানান, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পাঁচ মিলিলিটার রক্ত দিলে ক্ষতি কি! তাছাড়া রক্তদাতারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। শিবসেনার গুণ্ডার আপত্তি ভেঙে গিয়েছিল এ এন এস-এর একাধিক সমাবেশে।

মুক্তচিন্তক বিজ্ঞানকর্মী ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকর আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ২০ আগস্ট মোটরবাইক আরোহী দুই অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতির গুলিতে নিহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল মহারাষ্ট্রের পুনের ওঙ্কারেশ্বর ব্রিজের পাশে। সময় সকাল ৭ — ৭.৩০। তিনি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। বন্দুকধারীরা ৩/৪ টি গুলি চালিয়েছিল। নরেন্দ্র রেখে গেলেন স্ত্রী ডাঃ শৈলা, পুত্র হামিদ এবং কন্যা মুক্তা, আর ১৯৮৯ সালে তাঁর নিজের হাতে গড়া সংগঠন "অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি"। হত্যার খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে পুনে, সাতারা এবং মহারাষ্ট্রের অন্যান্য এলাকায়। মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বিরাজ চৌহান মুক্তচিন্তকের বাড়ি সাতারাতে পৌঁছলে বিজ্ঞানকর্মী এবং সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়েন — কুসংস্কার বিরোধী বিল অবিলম্বে পাশ করানোর দাবিতে। ২১ আগস্ট বিজ্ঞানকর্মী হত্যার প্রতিবাদে সর্বদলীয় বনধ্-এর ডাক দেওয়া হয় পুনেতে। এক হাজারের মতো মানুষ ওইদিন পথ অবরোধও করে। সকল রাস্তা ও বাণিজ্য এলাকা মরুভূমির মতো হয়ে যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন এবং ছাত্র সংগঠন বিশাল মিছিল করে ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের নিকট মহাত্মা ফুলে স্কোয়ারে জমায়েত হন।

নরেন্দ্র দাভোলকরের নিহত হওয়ার পরদিন থেকে মহারাষ্ট্র সরকার বিলটি আইনে পরিণত করার তোড়জোড় শুরু করেছে। ২১ আগস্ট মন্ত্রীসভার অনুমোদন পেয়েছে বিলটি। আপন রক্ত দিয়ে আমাদের মানসিকভাবে কয়েক কদম এগিয়ে দিয়েছেন দাভোলকর।

# খাদ্য আন্দোলনের শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানে নয়া খাদ্য সুরক্ষা আইনের সমালোচনা

**শমিত, হালিশহর, ৩১ আগস্ট •**
১৯৫৯ এর খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের স্মরণ করলো হালিশহর শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের সদস্যরা। আজ এই উপলক্ষ্যে বর্তমান খাদ্য সুরক্ষা বিল এবং সাধারণ মানুষের খাদ্যের নিশ্চয়তা — এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অর্থনীতিবিদ দেবব্রত পাণ্ডা। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করেছে, ৮২ কোটি মানুষ খাদ্য পায় না। সে জন্য অর্ডিনান্স জারি করেও খাদ্য সুরক্ষা বিল আনতে চাইছে তারা। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। চাল গম বাজরা জোয়ার মাথাপিছু পাঁচ কেজি করে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে, তা আদপে কতটা কার্যকরী করা যাবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। খাদ্য বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যর্থতা আগের মতোই থাকবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

দেবব্রতবাবু বলেন, খাদ্য সুরক্ষা বিল প্রকাশের আগে পর্যন্ত আশি হাজার কোটি টাকা সরকার ভর্তুকি দিয়েছে। বিল পাশের পর, এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা হবে, আসবে কোথা থেকে? বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির যা হার, এ ব্যাপারে কোনওরকম নিশ্চয়তা সরকার দিতে পারছে না। আর্থিক সংস্কার চালু হয়েছে ১৯৯১ সাল থেকে। প্রতিটি দশকে অর্থনৈতিক সংস্কার চলেছে। ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিক থেকে আইএমএফ-এর স্মরণাপন্ন হতে হয়েছিল ভারতকে। বর্তমানে যে হারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, আবারও আইএমএফের কাছে হাত পাততে হবে ভারতবর্ষকে।

তাঁর কথায়, মোট জিডিপির সিংহভাগ রয়েছে ১০০টি ধনী মানুষের হাতে। মার্জেন্ট গোষ্ঠীর সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে, দেশের মোট অর্থের বড়ো অংশটিই রয়েছে কতিপয় ধনীর হাতে। মুকেশ আম্বানির হাতে রয়েছে দু-হাজার কোটি ডলার। এক লক্ষ তিরিশ হাজার কোটি টাকার মালিক সে নিজে। বর্তমানে খাদ্য সুরক্ষা আইনের মধ্যে দিয়ে যে খাদ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তা চাল গম বাজরা জোয়ার বাজরা। এই সমস্ত দানা শস্য খেলেই অপুষ্টি দূর হয় না। তার জন্য চাই পুষ্টিকর অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী। সে ব্যাপারে সরকারের কোনোরকম উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

> **দেবব্রত পাণ্ডা**
> দানা শস্য খেলেই অপুষ্টি দূর হয় না, তার জন্য চাই পুষ্টিকর অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী।

দেবব্রতবাবু আরও বলেন, খাদ্য সুরক্ষা কথাটির আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত একটি অর্থ রয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন বা ফাও-এর মতে, খাদ্য সুরক্ষার অর্থ হলো : যখন সব মানুষের বছরের যে কোনও সময় পর্যাপ্ত শস্য কেনার মতো আর্থিক সামাজিক এবং শারীরিক সক্ষমতা থাকবে, তখন বলা যাবে খাদ্য সুরক্ষা রয়েছে। এখানে খাদ্য মানে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত খাদ্য, যা স্বাস্থ্যকর জীবনের প্রয়োজন মেটাতে পারে। বর্তমান খাদ্য সুরক্ষা বিল এর কোনোটারই হদিশ দিচ্ছে না। অর্থনীতিবিদের অভিমত, খাদ্য সুরক্ষা বিল 'পবিত্র বই'-এর মতো সরকারি মহাফেজখানাতে সুরক্ষিত থাকবে। বিরাশি কোটি মানুষ, অর্থাৎ দেশের সাতষট্টি শতাংশ জনতা সুরক্ষার আওতায় আসবে না।

আলোচনার আগে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী বিদ্যুৎ ভৌমিক ও নীতিশ রায়। মনোজ্ঞ আলোচনাটির পর নাটক পরিবেশিত হয়, 'উচ্ছেদ'। হালিশহর শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের সদস্যরা দেশের জল জমি পাহাড় বিক্রি করার যে চক্রান্ত, তার বিরুদ্ধে এই তথ্য নাটিকাটি অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে উপস্থাপন করে। কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে অডিটোরিয়াম, হাইডমার্টে এই স্মরণানুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

# 'ভক্তি করতে হবে ওই জ্যান্ত দেবতাকে, তাহলেই সাপে আর ভয় থাকবে না'

**শমিত, শান্তিপুর, ২৮ আগস্ট •**
নদীয়া জেলার প্রাচীন জনপদ খেদাইতলা (চাকদা-র সন্নিকটে) শ্রাবণী সংক্রান্তিতে প্রায় তিনশো বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয় মনসাপুজো ও সাপের মেলা। এই উপলক্ষ্যে সারা পশ্চিমবঙ্গ সহ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকেও শতাধিক সাপুড়িয়া তাদের সাপের ঝাঁপি নিয়ে উপস্থিত থাকে। বিভিন্ন রকমের সাপ, বিষধর এবং বিষহীন, দেখতে নদীয়া জেলা তো বটেই, সারা রাজ্যের মানুষই সেখানে সমবেত হয়।

বর্তমানে সাপুড়িয়ার সংখ্যা কমছে বলে জানা গেল বসিরহাট থেকে আগত স্বপন সাপুড়িয়ার কাছ থেকে। তিনি জানালেন যে সাপের খেলা দেখিয়ে আর পেট ভরছে না। সারা বছর এই সাপকে পুষতে প্রচুর খরচা-খরচ হয়। সেই কারণে সাপুড়িয়ার সংখ্যা ক্রমশ কমছে। মেলাটার অন্যতম বৈশিষ্ট্য মহিলা সাপুড়িয়া। দেখা যায় যে, শতাধিক মহিলা সাপুড়িয়া তাদের ছোটো ছোটো ঝাঁপি নিয়ে সাপ দেখিয়ে সমবেত মানুষদের কাছ থেকে উপার্জন করছে।

প্রায় পাঁচ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে মেলায় বিভিন্ন পসরা নিয়ে বিক্রেতারা হাজির থাকে। পসরার বৈচিত্র্য এখানে নজরকাড়া। হাল জোয়াল থেকে শুরু করে বেতের কাজ, মাটির কাজ, বাঁশের কাজ মানুষের নিত্য ব্যবহার্য দা-কুড়ুল-কোদাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম মাছ ধরার জাল সহ বিভিন্ন রকমের যন্ত্রাংশ এখানে পাওয়া যায়। মেলার অভিনবত্ব এখানেই, এখানে হারিয়ে যাওয়া বাংলার হুঁকো নিয়ে একাধিক বিক্রেতাকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। ক্রেতারা জেনে নিতে চাইল, হুঁকোর মশলাপাতি কোথায়? বিক্রেতা জানিয়ে দিলেন মশলার সুলুক সন্ধান। মশলা বাড়ন্ত হলে ক্রেতার হাতে উনি মশলা তুলে দিতে না পারার আক্ষেপ জানালেন।

মেলাটি ধর্মীয় হলেও প্রচুর সম্প্রদায়ের মানুষ, মূলত আদিবাসী এবং নিম্নবিত্ত মানুষের সমাবেশ চোখে পড়ল। চাকদা স্টেশন থেকে নেমে আধঘণ্টা টোটোতে গিয়ে বিষ্ণুপুর থেকে খেদাইতলা যেতে আরও পাঁচ কিলোমিটার হাঁটতে হয়। এই রাস্তার অধিকাংশটাই মাটির। পাট কাটা হয়ে যাওয়ার পর মূলত মাঠের মধ্যে দিয়ে হেঁটে মেলাতলায় পৌঁছতে হয়। এবারের শ্রাবণী সংক্রান্তিতে প্রখর রৌদ্রে মানুষকে ক্লান্ত করে তুলতেও দেখা গেল। তবে সাম্প্রতিক পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে খানিকটা রাস্তা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়াতে মানুষের যাতায়াতের খানিকটা সুবিধাই হয়েছে।

মেলায় মূলত পূজিত হন, মনসাদেবী এবং শিবঠাকুর। প্রচুর ছাগবলি হয়। ছাগলের রক্তে জায়গাটা কাদা হয়ে যায়, এটা দৃষ্টিকটুও বটে।

শান্তিপুর থেকে প্রায় দশজনের এক বিজ্ঞানকর্মী, ফোটোগ্রাফারের দল এই মেলাতলায় উপস্থিত হয়েছিল এবার, মূলত সাপুড়িয়াদের সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যেই। সাপুড়িয়ারা খেলায় ব্যস্ত থাকায় কথা খুব বেশি হয়নি। শান্তিপুরের বিজ্ঞানকর্মী মনোজ প্রামাণিক, অনুপম সাহা — এরা জেনে নিতে চাইল যে, সাধারণ মানুষের ভেতরে সাপ নিয়ে যে ভীতি রয়েছে, তা কাটানোর কোনো উপায় সাপুড়িয়াদের জানা আছে কি না। সাপুড়িয়ারা জানাল, 'ভক্তি করতে হবে ওই জ্যান্ত দেবতাকে। তাহলেই সাপে আর ভয় থাকবে না।'

মেলায় সাপুড়িয়ার ছবি তুলেছেন মনোজ প্রামাণিক।

Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

# আমার ডুয়ার্স ভ্রমণ

*আহেলী তপাদার, রবীন্দ্রনগর, সন্তোষপুর, ১৩ আগস্ট* •
আমি আগে জানতামই না যে আমরা ডুয়ার্স যাচ্ছি। মা–বাবা আমাকে হঠাৎ চমকে দিল, আমরা ডুয়ার্স যাচ্ছি। আমরা মানে আমি, মা আর আমাদের সাথে মাসি, মেসো আর আমার মাসতুতো দাদাও যাবে। আমরা সবাই মিলে প্রথমে গেলাম হুগলির চুঁচুড়ায়, সেখানে আমার মাসির বাড়ি। সেদিনই ব্যান্ডেল জংশন থেকে আমরা তিস্তা–তোর্সা এক্সপ্রেসে উঠলাম। আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসলাম।

এইখানে বলে রাখি, আমার মাসতুতো দাদার নাম সমন্বয় গুহ। সে ক্লাস ইলেভেনে পড়ে। আমার চেয়ে চার বছরের বড়ো। বড়ো দাদা হিসেবে আমার ওপর সবসময় শাসন করতে চেষ্টা করে। যখন পারে না তখন মারপিট শুরু করে দেয়। যাই হোক আমি ওকে বেশি না ঘাঁটিয়ে ট্রেনে খেয়েদেয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে মায়ের নির্দেশ মতো ট্রেনেই পরিচ্ছন্ন হয়ে নিলাম। যথাসময়ে ট্রেন নিউ আলিপুর জংশনে এসে থামল। আমরা সবাই নেমে পড়লাম। তারপর স্টেশনের বাইরে এসে রিকশা করে আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। হোটেলের রুম আগেই বুক করা ছিল। তাই হোটেলে পৌঁছে আমরা সোজা লাগেজ নিয়ে রুমে চলে গেলাম। আমাদের হোটেলের নাম 'হোটেল শিবম্'। হোটেলটা বেশ পরিষ্কার। আমাদের ঘরের মধ্যে একটা বিশাল জানলা রয়েছে। জানলার পাশেই বাথরুম আর বেসিন। তারপর সোফা, খাট আর টেবিলের ওপর একটা টিভি। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, বাইরে তেমন কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু একজনের বাড়ি।

প্রথমদিন আমরা গেলাম চিলাপাতা জঙ্গলে। ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর। সকালবেলাতেও চারদিকে ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ শোনা যায়। ছায়াঘেরা জঙ্গলটাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগল। একটা হুটখোলা জিপ ভাড়া করা হয়েছিল। সেটাতে চেপে আমরা প্রথমেই গেলাম ওয়াচ টাওয়ারে। টাওয়ার থেকে দুটো গন্ডার, একটা ময়ূর আর দূরে একটা হাতি দেখতে পেলাম। হাতিটা এত দূরে ছিল যে দূরবীন দিয়ে দেখতে হল।

ওখান থেকে আমরা গেলাম নলরাজার গড়ে। এটা একটা প্রাচীন গড়, নলরাজার তৈরি। গড়ের উল্টোদিকে একটা গাছ ছিল। তার গায়ে কোপ মারতেই রক্তের মতো কষ বেরিয়ে এল। এই চিলাপাতা জঙ্গলে নাকি ২৮টা এরকম গাছ ছিল। কিন্তু মানুষ ওই রক্তের মতো তরল পদার্থ দেখবার ঝোঁকে দুটো গাছ মেরে ফেলেছে। এখন সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ২৬। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। তাই আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন আমরা যাব জয়ন্তী।

জয়ন্তী একটা নদীর নাম। সেই নদী পেরিয়ে দেখতে পেলাম মহাকাল মন্দির। এই জায়গাটা পাহাড় দিয়ে ঘেরা বলে আমার চোখে এর সৌন্দর্য যেন আরও বেড়ে গেল। নদীর পাশে একটা জায়গায় অনেক বড়ো বড়ো ঘাস আছে, আন্দাজ চার ফুট উঁচু। অনেক গরু এই ঘাস খেতে আসে। তাই বাঘও বেশি আসে এখানে। মহাকাল মন্দিরের ভেতরে একটা পাথরের মহাদেবের মূর্তি আছে।

পরদিন আমরা গিয়েছিলাম বক্সার জঙ্গলে। জঙ্গলে ঢুকে আমরা একটা চিতা বাঘের টাটকা পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। ওর গায়ের গন্ধও পাচ্ছিলাম। কিন্তু চিতা বাঘটাকে না দেখতে পেয়ে দুঃখ হল। কিন্তু আমাদের দুঃখ ঘুচে গেল, দেখি পরপর পাঁচটা হাতি। দুটো বড়ো হাতির সঙ্গে চলেছে তিনটে বাচ্চা। একটু পরেই ওরা চলে গেল। ইস্ ওরা যদি আর একটু থাকত আমাদের সামনে।

এবার ফেরার পালা। সেদিন বিকেলেই ট্রেন। তাড়াতাড়ি চান–খাওয়া সেরে নিতে হল। ডুয়ার্স ছেড়ে ফিরতে ইচ্ছে করছিল না।

# উচ্চারণ অনুযায়ী বানানের প্রবক্তা
# মহাত্মা শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকারের দ্বিশত বর্ষ উদ্‌যাপন

*১৯ আগস্ট, দীনবন্ধু বিশ্বাস, শান্তিপুর* •
১১ আগস্ট ২০১৩ রবিবার বিকালে 'গোরাগাঙনি' সাহিত্য পত্রিকার শান্তিপুর শাখার উদ্যোগে মহাত্মা শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকারের দ্বিশত বর্ষ সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন হল শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরির নির্মলেন্দু লাহিড়ী মঞ্চে। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক দুটি গান পরিবেশিত হল। সেই সুরের দোলায় দুশো বছরের অতীত শ্যামাচরণ যেন নতুন করে জেগে ওঠেন। স্বাগত ভাষণ দান করেন শ্রী অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। এরপরেই মহাত্মা শ্যামাচরণের স্মরণে 'স্মারক পত্র' প্রকাশ করেন ড. বারিদবরণ ঘোষ। তিনি একইসঙ্গে 'উনিশ শতকের নবজাগরণে শ্যামাচরণের ভূমিকা' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। অজানা তত্ত্ব ও তথ্যের আবেশে বিহ্বল উপস্থিত তিনশত দর্শক।

নদিয়ার মামজোয়ান থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে দিল্লি, শ্যামাচরণের নবজাগ্রত চেতনা ও পাণ্ডিত্য কীভাবে ছড়িয়ে পড়ল, বাক্যের আলপনাতে তা সুন্দরভাবে আঁকলেন ড. ঘোষ মহাশয়। এই মুগ্ধতার ঘোর কাটতে না কাটতেই ড. নির্মল দাসের আলোচনা ছিল 'বাংলা ব্যাকরণের ক্রমবিকাশ ও শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার'। রামমোহনের গৌড়ীয় ব্যাকরণের (১৮৩৩) পরেই শ্যামাচরণের 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৮৫২) প্রকাশিত হয়। ড. দাস আমাদের জানালেন, এর মাঝে আর কোনো বাংলা ব্যাকরণ সেভাবে রচিত হয়নি। শ্যামাচরণ ছিলেন বাংলা ব্যাকরণ চর্চায় তুলনামূলক ব্যাকরণ চর্চার জনক। তিনিই প্রথম উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখার কথা ঘোষণা করেন। এগারোটি ভাষা অনর্গল বলতে ও লিখতে পারতেন শ্যামাচরণ।

শুধু একতরফা আলোচনাই হয়নি, বক্তৃতার ফাঁকে প্রশ্নোত্তরের সুযোগও ছিল। নদিয়ার *বাদকুল্লা শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার দ্বিশত বর্ষ উদ্‌যাপন শাখা কমিটির* পক্ষ থেকে একজন প্রশ্ন করেন, 'এত পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্ব থাকা সত্ত্বেও শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকারের নাম কেন আজও বাঙালির কাছে অজানা?' এর উত্তরে অধ্যাপক দাস বলেছেন, 'বাঙালির বিস্মৃতি। আমরা ভুলতে ভালোবাসি। কষ্ট করে মনে রাখি না। ...'

চা পানের বিরতির পর দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা সাতটায়। প্রথমে হল শ্যামাচরণ বিষয়ক দুটো নাটক — সমর ভট্টাচার্য লিখিত ও নির্দেশিত শ্রুতিনাটক 'ফিরে পাওয়া' এবং সুবীর দাস পরিচালিত মঞ্চনাটক 'অন্বেষণ'। এই নাটকের ৬ জন কুশীলবের বয়স ১৫ বছরের নিচে। কী পরিশ্রমে দুশো বছরের অবজ্ঞার ধুলোবালি ঝেড়ে শ্যামাচরণকে বার করে নিয়ে এলেন কয়েকজন যুবক–যুবতী। অনেকদিন পর শান্তিপুরবাসী এমন এক শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান উপহার পেল।

# শিবু, তুই চলি গেলি!

*মানস বন্দোপাধ্যায়, শহিদনগর কলোনি, হালতু, ৩১ আগস্ট* •
আমার স্মৃতিতে অটুট মোহময় সেই কৈশোরের দিনগুলি। অরুণদার গড়া (শ্রী অরুণ চক্রবর্তী, বর্তমানে জার্মানীতে) 'কিশোর বাহিনী' পরবর্তীতে 'শহিদ স্মৃতি সব পেয়েছির আসরে'। প্রতিদিনে ভোরে শরীরচর্চা, কুচকাওয়াজ আর বিকেলে সদস্যদের খেলাধূলা নিয়ে মেতে থাকা। মনীষীদের জন্মদিনে আলোচনা সভা, ২৫ বৈশাখে রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন — নববর্ষে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তের সব পেয়েছির আসরের কেন্দ্রীয় জমায়েতে কলকাতার বড়ো পার্কে কুচকাওয়াজ, ব্রতচারী, যোগ ব্যায়াম প্রদর্শনীতে আমরা বিপুল উৎসাহে অংশ গ্রহণ করতাম, আর সবশেষে বড় প্রাপ্তি রাংতা মোড়া খাবারের প্যাকেট।

প্রতি রোববার অরুণদার নেতৃত্বে আমরা শহিদনগর কলোনি অঞ্চলে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে — যেমন রাস্তাঘাটের সংস্কার, ঝিলের কচুরিপানা পরিষ্কার কাজগুলি করতাম হৈ হৈ করে। মনে পরে প্রত্যেকদিন সকালবেলা বিনামূল্যে কানাডা–অস্ট্রেলিয়া থেকে পাওয়া গুঁড়ো দুধ জলে গুলে বিতরণ হত কলোনিবাসীর মধ্যে। প্রতিবছর শীতে বাহিনীর সভ্যদের নিয়ে সোনারপুর, বারুইপুর, ডায়মন্ডহারবার, বারাসাত যেতাম বনভোজন করতে। যাওয়া আসার মাঝে সকলে মিলে গাইতাম সুরে বেসুরে অসংখ্য গান। মন অধীরে আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকতো — কবে পুজো আসবে। এ সময়ে কচি–কাঁচাদের হাতে আঁকা ছবি তৈরি করা মডেল, ছবিতে মানব সভ্যতার ও মানুষের ক্রমবিবর্তন, নানা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রত্যক্ষ প্রয়োগের মডেল প্রদর্শিত হত 'ক্ষুদে কিশোরের মেলা'য়। ছবিগুলি তো আঁকা হত অরুণদা আর শক্তিপদ চক্রবর্তীর। সদস্যদের লেখা থেকে নির্বাচিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা নিয়ে হাতে লেখা শারদ পত্রিকা 'উদয়ের পথে' প্রকাশিত হত। বিজয়া দশমীর পরের দিনগুলিতে আমরা দল বেঁধে যেতাম শুভেচ্ছা বিনিময়ে। সেই সুবাদে পেতাম নারকেল নাড়ু, ঘুগনি আর শুকনো মিষ্টি। শিবু তোদের বাড়িতে তোর মায়ের কাছে গিয়ে আবদার করে বিশেষ বিশেষ খাবারও পেতাম। মনে আছে, তোর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফর্ম ভর্তির সময় আদর্শ শিক্ষায়তনে সহকারী প্রধান শিক্ষক আমার বাবা স্বর্গীয় জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় তোর বয়স হিসেব করে বসিয়ে দিয়েছিল। স্কুল পেরিয়ে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে বিজ্ঞান বিয়য়ে ভর্তি হয়ে বাম ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে দিলি সফলভাবে।

আমরা ভিন্ন ভিন্ন কলেজে ভর্তি হওয়ায় আমাদের যোগাযোগের সেতু হয়ে উঠল শহিদ স্মৃতি সংঘের সক্রিয় সদস্যরূপে। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৭ আনুমানিক সময়ে শহিদ স্মৃতি সংঘের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শ্রী মাখন সেনগুপ্ত, আর শিবু তুই ছিলি সংস্কৃতি সম্পাদক। স্বর্গীয় প্রশান্ত দাশগুপ্তের পরামর্শ ক্রমে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী আয়োজন, এছাড়া সংঘের পরিচালনায় নিয়মিত নাটক, গীতিনাট্য, ঋতুরঙ্গ, বর্ষামঙ্গল গান খেলাধুলার মাধ্যমে আমরা এক সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। গড়ে তুলেছিলাম গ্রন্থাগার। পাঠকের সংখ্যা বাড়ানোর আগ্রহ ছিল বেশি। শিবু, এই সমস্ত কর্মকান্ডে আমাদের টিমের স্পিরিট হিসাবে সর্বদাই তুই সক্রিয় ছিলি। কর্মজীবনে প্রবেশ করে তুই টিটাগড় মিলে কাজ পেলি, টেকনিক্যাল ডিভিশনে। কারখানা বন্ধ হলে নিজস্ব যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজস্ব উদ্যোগেই জীবিকা নির্বাহ করলি।

সাংগঠনিক কাজে তুই বরাবরই ছিলি দক্ষ এবং উদ্যোগী। নানাস্তরে ছিল তোর যোগাযোগ। শহিদ নগর, নস্করপাড়া, ঢাকুরিয়া অঞ্চলের বহু মানুষের ভালোবাসা তুই পেয়েছিস। চাকরি সূত্রে বাইরে থাকায় মাঝের কিছু দিন তোর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা থাকলেও, তোর সক্রিয়তা থেকেই গিয়েছিল। বেশ কয়েকবছর ধরে তুই সৃজনীর প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেকের উদ্যোগে শুরু হওয়া 'ভ্রাম্যমান রবীন্দ্র জন্মোৎসব কমিটি'–র সাথে যুক্ত হয়ে আবার নতুন করে এলাকায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনলি। রবীন্দ্র জন্মোৎসব কমিটির ২৫ বছর উপলক্ষ্যে তুই এবার সারা বছর ধরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার কথা বললি। কয়েক বছর আগে 'জনস্বার্থ রক্ষা মঞ্চ'–র উদ্যোগে জলাশয় রক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার কাজেও যুক্ত হয়ে পড়লি। তোর জীবনের নানা পারিবারিক বিপর্যয়েও তুই তোর সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সরে যাসনি। কিন্তু ছাড়তে পারলি না তোর সিগারেটের অভ্যাস। আর সেটাই আমার আপত্তি ছিল। কিন্তু তুই শুনিস নি। তোর হঠাৎ করে চলে যাওয়ায় আমরা সকলেই স্তম্ভিত। কাঁচের ফ্রেমে বন্দি হওয়া তোর ছবি দেখে চোখের জল আর আটকাতে পারলাম না।

# খ ব রে দু নি য়া

## ফুকুশিমার নয়া বিপর্যয়, দিনে দশ টন করে তেজস্ক্রিয় জল মিশেছে ভূ–গর্ভস্থ জলের উৎসে

*শমীক সরকার, কলকাতা, ২২ জুলাই, তথ্যসূত্র ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক* •
বিপর্যস্ত ফুকুশিমা পরমাণু চুল্লি থেকে তেজস্ক্রিয় জল গিয়ে মিশছে ভূ–গর্ভস্থ জলের উৎসেও। ২০১১ সালের বিপর্যয়ের সময় থেকেই প্ল্যান্টের ফুটো দিয়ে গিয়ে ভূগর্ভস্থ জলের উৎসে তেজস্ক্রিয় জল মিশছিল। এতদিন সেকথা স্বীকার করেনি প্রকল্পটির মালিক শক্তি–কর্পোরেট টেপকো। তারা বলে আসছিল, ভূ–গর্ভস্থ জলে নয়, প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে মিশছিল। কিন্তু ১১ জুলাই খোদ জাপান সরকার স্বীকার করে, প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে সাথে ভূ–গর্ভস্থ জলের উৎসেও মিশছিল প্রকল্পের তেজস্ক্রিয় জল। ২২ জুলাই টেপকোও সেকথা স্বীকার করে।

কেন এই স্বীকারোক্তি? চুল্লিগুলির আশেপাশের ভূ–গর্ভস্থ জলে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরিমাপক কিছু যন্ত্রে ৯ জুলাই অস্বাভাবিক বেশি মাত্রার সিজিয়াম পাওয়া যায়। এমনকি ৬ জুলাই যে পরিমাণ সিজিয়াম পাওয়া যায়, তার তুলনায় ৯০ গুণ বেশি পাওয়া ৯ জুলাই (প্রতি লিটার জলে ৯০০০ বেকারেল সিজিয়াম–১৩৪ এবং ১৮,০০০ বেকারেল সিজিয়াম–১৩৭)। মে মাস থেকে ফুকুশিমার পরের যে বন্দর সেখানকার সমুদ্রের জলেও ট্রিটিয়াম পাওয়া যাচ্ছিল। ৩ জুলাই সেখানে পাওয়া যায় এক লিটার জলে ২৩০০ বেকারেল ট্রিটিয়াম।

পরমাণু প্রক্রিয়া, অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় জ্বালানির পূর্ণাঙ্গ জ্বলন (গলন বা মেল্টডাউন) একবার শুরু হয়ে গেলে তাকে থামানো যায় না। তখন ঠান্ডা করে রাখতে হয় তাকে। সুনামিতে জ্বলন নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর ফুকুশিমার একাধিক চুল্লিতে মেল্টডাউন শুরু হয়ে যায়। তাকে ঠাণ্ডা করার জন্য জল স্প্রে করা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু ওই স্প্রে করা জল তো প্রকল্পের তেজস্ক্রিয়তা এবং জ্বালানির সংস্পর্শে এসে নিজেও ভয়ানকভাবে তেজস্ক্রিয়। তার কী হবে? প্রথমে ওই জল সমুদ্রেই ফেলছিল কোম্পানি, কিন্তু সমুদ্রের মাধ্যমে এই আবিশ্ব দূষণে প্রভাবশালী দেশগুলি পর্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করে। তখন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য গোটা প্রকল্প এলাকা জুড়ে ১০০০ তেজস্ক্রিয় জল জমানোর ট্যাঙ্ক বানায় টেপকো কোম্পানি। এই ট্যাঙ্কগুলোর মধ্যে রয়েছে মারাত্মক তেজস্ক্রিয় জল। টেপকো জানায়, এই তেজস্ক্রিয় জল জমানোর ট্যাঙ্কগুলোর বেশির ভাগই স্টিল ওয়েল্ডিং করে বানানো, লিক করার ভয় নেই। কিন্তু পরের দিকে তাড়াহুড়ো করে বানানো ৩৫০টি ট্যাঙ্ক স্টিলের সঙ্গে প্লাস্টিকের জোড় দিয়ে বানানো হয়েছিল। সেগুলো থেকেই অন্তত চারবার লিক করেছে তেজস্ক্রিয় জল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাওয়ায় বড়ো কোনও বিপর্যয় হয়নি। কিন্তু এবারে প্রায় মাসাধিক কাল জুড়ে লিক হলেও কেউ টের পায়নি। ফলে এই এক মাস ধরে দিনে অন্তত ১০ টন ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয় জল ভূ–গর্ভস্থ জলের সঙ্গে মিশেছে, এবং সাথে সাথে কাছেই যেহেতু সমুদ্র, তাই সমুদ্রের জলে গিয়েও পড়েছে।

জাপান তথা সারা বিশ্ব জুড়ে আলোড়ন পড়ে যায় এই স্বীকারোক্তিতে। জাপান সরকার এই নয়া বিপর্যয়কে তিন মাত্রার পরমাণু বিপর্যয় বলে চিহ্নিত করে। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের মার্চ মাসে সুনামিতে ফুকুশিমা চুল্লিগুলির ধ্বংস হয়ে যাওয়াকে সাত বা সর্বোচ্চ মাত্রার পরমাণু বিপর্যয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

এখনও ফুটো কোথায় হয়েছে, তা খুঁজে পায়নি টেপকো, কিন্তু ফুটো হওয়া ট্যাঙ্কটি চিহ্নিত করা গেছে। সেটি খালি করা হয়েছে।

## 'বোমা ফেলে, দ্রোন মেরে, খুন করে নয়; শান্তি আসে ভেতরের সহমর্মিতা ও ক্ষমা থেকে'

*এক সিরিয়ান মহিলার টুইটার অ্যাকাউন্টে পাওয়া এই ছবিটি — আপাতদৃষ্টিতে কোনও এক মার্কিন নেভি অফিসার পোস্টার ধরে রয়েছেন, 'সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে আল কায়দার হয়ে লড়ার জন্য আমি মার্কিন নৌবাহিনীতে যোগ দিইনি'। সিরিয়ানদের অনেকেই মনে করে, সশস্ত্র সিরিয়ান বিদ্রোহীরা, বা 'ফ্রি সিরিয়ান আর্মি' আসলে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আল কায়দার সংগঠন। এদের বিরুদ্ধেই গত সপ্তাহে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগের অভিযোগ উঠেছে স্বৈরাচারি আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে।*

*আমেরিকার সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি প্রসঙ্গে অকুপাই ওয়াল স্ট্রীটের আহ্বান, ৩১ আগস্ট* •
আমেরিকান জনতার ইচ্ছার তোয়াক্কা না করে আবার একটি যুদ্ধে যাওয়ার মার্কিন সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করছে 'নো ওয়র উইথ সিরিয়া' (সিরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ নয়) আন্দোলন। এই আন্দোলন কখনোই সিরিয়ার আসাদ জমানার কার্যকলাপকে সমর্থন করছে না, কিন্তু আমরা মনে করছি, মার্কিন হস্তক্ষেপে সিরিয়াতে হিংসা এবং দুর্ভোগ বাড়বে আরও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক মন্দা এবং অন্তহীন যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই আছে, তার মধ্যে ফের সিরিয়াতে মজে গেলে যেমন মধ্য প্রাচ্যে অস্থিরতা বাড়বে, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের ভাঁড়ার আরও খালি হবে। 'নো ওয়র উইথ সিরিয়া' আন্দোলন জানে, আমেরিকান জনতাই কেবল পারে মধ্য প্রাচ্যে মার্কিন আগ্রাসন ঠেকাতে, যেমন মধ্য প্রাচ্যের মানুষই পারে তাদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ কলহ থামাতে।

আমরা সবাইকে আহ্বান করছি, আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আবার একটি মার্কিন আগ্রাসনের বিরোধিতা করতে। আমরা জানি যে বোমা ফেলে, দ্রোন মেরে, খুন করে শান্তি আনা যায় না; শান্তি আসে সহমর্মিতা ও ক্ষমা থেকে, যা ভেতর থেকেই আসতে হবে। ...

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata 9. Published at B23/2 Rabindranagar, P.O. Bartala, Kolkata-18. Editor Shamik Sarkar